ষষ্ঠ সেমিস্টার: SEC B2

স্টাডি মেটেরিয়াল

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা

"Envy is an admission of inferiority"—**Victor Hugo.**

"Life is like a mirror. Smile at it and it is charming ; frown at it and it becomes sinister."

—**Edwige Fenilliers.**

● বক্তৃতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ঃ

কোন বিশেষ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বা অনুষ্ঠানে সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করে বক্তা যখন নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন, তাকেই সাধারণভাবে বক্তৃতা বলা হয়।

উপস্থিত কোন উপলক্ষে কিংবা তৎক্ষণাৎ কোন কিছু বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন হলে তাকে বলা হয় **তাৎক্ষণিক বক্তৃতা**। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না—এটি একটি বিশেষ গুণ ; এর জন্য পূর্ব থেকে অনুশীলন করতে হয়। স্কুল-কলেজে যাঁরা এই ধরনের তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন ; তাঁরা পরবর্তীকালে উঁচু দরের বাগ্মী হন।

সাধারণভাবে কথা বলা এবং অভিভাষণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে কথা বলার জন্য কোন অনুষ্ঠান বা সভার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভাষণের জন্য সভা বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং এই ভাষণ সাধারণতঃ পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকে। সাধারণভাবে কথা বলার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতির দরকার নেই ;—কিন্তু সভা বা অনুষ্ঠানের নানা নিয়মের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভাষণের বিষয়, প্রকৃতি ও রীতি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ভাষণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করে নিতে হয়। ফলে ভাষণের ভাষা সাধারণ আলাপের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। এই ভাষা হয় কিছু পরিমাণে সজ্জিত (decorative), সংহত (compact) ও অলঙ্কারময় (figurative) ; অথচ সহজ, সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল। ভাষণের সার্থকতা কেবল বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—কিছুটা বক্তার প্রকাশভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের উপরেও নির্ভর করে। অভিভাষণের সার্থকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে বক্তার বাক্‌পটুতা ও বাগ্‌বিন্যাসের সফলতার উপর। হৃদয়ের ভাব ও ভাবনাকে সুস্পষ্টভাবে অন্যের মনের কাছে পৌঁছে দেবার আসল চাবিকাঠিই এই সাফল্যের মূল কারণ।

● ভাষণ ও প্রবন্ধের পার্থক্য ঃ

ভাষণ ও প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয় এবং সেই অভিমত সোজাসুজি প্রকাশ না করে যুক্তি-তর্ক ও তথ্যের জাল বিস্তার করে নানা বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। অনেক সময় তাই কোন কোন বক্তাকে দেখা যায়—ভাষণ হিসেবে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করতে। ভাল বক্তা মাত্রেই কখনও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে ভাষণ সম্পূর্ণ করেন না। লিখিত প্রবন্ধের নোট-এর সাহায্য নিয়ে তাকে নিজের মত সাজিয়ে বাগ্‌বিন্যাসের মাধ্যমে ভাষণকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়।

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভাষণ ও প্রবন্ধের বিস্তর পার্থক্য। প্রবন্ধের বক্তব্য স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—অথচ ভাষণের বক্তব্য বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্রকে উপলক্ষ্য করে প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ জনসমষ্টির

সামনে বিশেষ উদ্দেশ্যে আহূত সভায় বা অনুষ্ঠানে বক্তাকে ভাষণ দিতে হয়। বক্তা তাঁর বক্তব্যকে জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে চান এবং শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে উপভোগ্য করে তোলেন। নিজ বক্তব্য বা অভিমতের প্রতি শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক ও সমসাময়িক ঘটনার বা প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়। কখনো কখনো-বা বক্তার নিজের কোন বক্তৃতায় কিংবা অন্য বক্তার বক্তৃতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়।

ভাষণ দিতে গিয়ে বক্তা কখনো স্বাধীনভাবে উচ্ছ্বাস বা তির্যক কৌতুক প্রকাশ করতে পারেন ; কিন্তু লিখিত প্রবন্ধে এত সুযোগ থাকে না। বক্তা অনেক সময় সাময়িক প্রসঙ্গের কথা তুলতে পারেন, কখনো বা চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলতে পারেন এবং তার বক্তব্য বিষয়কে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দু-একটি ক্ষেত্রে জটিল মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। প্রাবন্ধিকের এই সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে না। ভাষণের বিষয় সাময়িক ঘটনা বা প্রসঙ্গকে উদ্দীপ্ত করে বেশি পরিমাণে ; কিন্তু প্রবন্ধে চিরন্তন বিষয়কেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। প্রবন্ধের বিষয় কালের কষ্ঠি-পাথরে যাচাই হয়। কিন্তু ভাষণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। প্রবন্ধ তাই সাহিত্যধর্মী ; ভাষণ সাহিত্যধর্মী নয়। ভাষার প্রয়োগের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রবন্ধের ভাষা শিল্প-শ্রী-মণ্ডিত ; ভাষণের ভাষা অনেকটা সোচ্চার ও উদ্দীপক। ভাষণের ভাষা একান্তভাবে প্রত্যক্ষ ; প্রবন্ধের ভাষা সকল সময়ে তা হয় না।

● **অভিভাষণের বৈশিষ্ট্য ঃ**

(১) **স্বাভাবিকত্ব ঃ** অভিভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য বক্তব্য বিষয়কে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা। বক্তব্য যেন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং তা যেন নীরস প্রাণহীন না হয়।

(২) **একঘেঁয়েমি বর্জন ঃ** একই কথা বারংবার বললে কিংবা একই যুক্তি বারংবার প্রদর্শিত হলে বক্তৃতার মধ্যে একঘেঁয়েমি আসতে বাধ্য। এই একঘেঁয়েমি থাকলে তা শ্রোতৃবৃন্দের মনকে কিছুতেই উদ্দীপিত করতে পারে না। শ্রোতৃবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাতে। এই কারণে ভাল অভিভাষণ রচনায় একঘেঁয়েমি বা গতানুগতিক বিষয়ের অবতারণা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) **বক্তব্য প্রকাশের আন্তরিকতা ঃ** বক্তা যদি তার বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজস্ব মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তবে শ্রোতৃবর্গ তা আন্তরিকতার সঙ্গে নিতে পারে না। বক্তা যখন শ্রোতাদের একান্ত আপনজন হয়ে নিজেকে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে মনের বিচারে আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তখনই তা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়। এজন্য চাই সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও শিষ্ট ভাষার সাহায্য। বক্তা মার্জিত রুচির শব্দ প্রয়োগের দ্বারা শ্রোতৃবর্গের 'কাছের মানুষ' হয়ে উঠবেন। ফলে শ্রোতৃবর্গের মানসিক স্তরের উপযোগী করে তাকে যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে—বক্তব্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৪) **প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঃ** অভিভাষণের মধ্যে বক্তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রকাশ ; এতে ভাষণ সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বক্তা তার অভিভাষণে ব্যক্তিগত ক্ষোভ-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতির কথা ব্যক্ত করলে তা সহজেই শ্রোতৃবর্গের মনে দাগ কাটতে পারে এবং তাতে বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের আন্তরিক যোগ সহজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো বক্তাকে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে ; নচেৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকতে পারে। মনে রাখতে হবে—বক্তা আপন বক্তব্যের প্রতি শ্রোতাদের অভিভূত করার জন্যই এই কাজটি [illegible] গুরুত্ব বেড়ে যায়।

(৫) **পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন ঃ** সভার পরিবেশ ও বিষয় অনুযায়ী ভাষণের ভাষা নির্বাচিত হয়। কোন জন্মদিন বা জয়ন্তী উপলক্ষে সভায় প্রদত্ত ভাষণ এবং কোন শোকসভায় প্রদত্ত ভাষণের ভাষা এক হতে পারে না। কেবল তাই নয় ; উভয় ক্ষেত্রে ভাষা নির্বাচন সভার পরিবেশই স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, কোন ধর্ম-সম্মেলনের বা সাহিত্য সম্মেলনের পরিবেশ কোন শ্রমিক ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক সম্মেলনের পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র। সভার পরিবেশ এবং শ্রোতৃবর্গের মানসিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তাকে ভাষণের উপযোগী ভাষা ও ভাব পরিবেশন করতে হয়।

(৬) **পরিমিত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঃ** ভাষণের মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের অবকাশ আছে ; কিন্তু তা জন-চিত্তে রেখাঙ্কিত করার জন্য যথেষ্টভাবে পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। উচ্ছ্বাস ও আবেগের আতিশয্য থাকলে বক্তা তার ভাষণ দেওয়ার সময় ভাষণের সূত্র হারিয়ে ফেলতে পারে এবং পরবর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি নষ্ট করে ফেলতে পারে। এই কারণে বক্তাকে আবেগ, উচ্ছ্বাস প্রকাশ ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবতারণার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক হতে হবে। মাঝে মাঝে উচ্চগ্রামে বা নিম্নগ্রামে গলার স্বর তুলে বা নামিয়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করলে তা বেশ আকর্ষণীয় হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় modulation of voice।

(৭) **বক্তব্য বিষয়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খল পরম্পরা বিন্যাস ঃ** বক্তব্য বিষয়ের সূত্র এলোমেলোভাবে প্রকাশিত হলে ভাষণ সুন্দর হয় না। স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষে বক্তব্য বিষয়ের সামঞ্জস্য সূত্রগুলিকে আগে থেকে সাজিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। পারস্পরিক ও পরম্পরা-সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খল পরম্পরা-বিন্যাসের উপরই ভাষণের সাফল্য প্রধানভাবে নির্ভর করে। উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী বক্তা নূতন বিষয়ের সংযোজন করতে পারেন ; কিন্তু তা-ও যেন পূর্বাপর বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৮) **বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ঃ** ভাষণ দীর্ঘ হলে একঘেঁয়ে হতে বাধ্য ; এইজন্য বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশন করতে পারলে ভাষণ সজীব হয়ে ওঠে ; ব্যঙ্গরস পরিবেশন করতে পারলে আরও ভাল হয়। তবে এই ব্যঙ্গরস যেন wit না হয় ; অর্থাৎ অন্যকে আঘাত না করে। Humour অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাস্যরস ভাষণের তীব্রতা ও গতিবেগ যে অনেকখানি পরিমাণে বৃদ্ধি করে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে বক্তার মুদ্রাদোষ থাকলে তা শ্রোতৃবর্গের নিকট যথেষ্ট পরিহাসের কারণ হয়ে ওঠে—তাতে বক্তৃতার বিষয় হালকা হয়ে ওঠে। বক্তাকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে অধিক মাত্রায়।

(৯) **উদ্ধৃতি ও উপমা প্রয়োগের সার্থকতা ঃ** বক্তা অনেক সময় তাঁর বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য এবং অন্যান্য মহাপুরুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিজস্ব মতকে এক করে তোলার জন্য মহাপুরুষ কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে উপমার প্রসঙ্গ আনতে পারেন কিংবা তাঁদের রচনাংশ থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করতে পারেন। তবে, স্মরণ রাখতে হবে যে, উদ্ধৃতি কিংবা উপমা প্রয়োগ যেন নির্ভুল হয় এবং উদ্দিষ্ট শ্রোতৃবর্গের বুঝবার পক্ষে অসুবিধা না হয়। উপমা ও উদ্ধৃতির প্রয়োগে অনেক সময় একঘেঁয়েমি কাটে।

(১০) **ভাষণের সামগ্রিক আবেদন ঃ** ভাষণের সর্বশেষ কথা সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি। ভাষণ যতই আঙ্গিকসম্পন্ন হোক, বাচনভঙ্গিতে সমৃদ্ধ হোক ; তার সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টিই বড়ো কথা। বক্তা যে বিষয়টি সর্বসমক্ষে পরিস্ফুট করতে চান, ভাষণের শেষে যেন সেই বিষয়টি সকলের মনকে অভিভূত করতে সক্ষম হয়। খুঁটিনাটি বিষয় কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হলেও

তাতে কিছু যায় আসে না—যদি তার সামগ্রিক রসাবেদনটুকু অব্যাহত থাকে। অভিভাষণের প্রথম ও শেষ কথা সেইটিই।

● **অভিভাষণের বিভিন্ন অংশ ঃ**

যে কোন প্রকার অভিভাষণের প্রধান অংশ পাঁচটি ঃ

(১) সম্ভাষণ বা সম্বোধন, (২) প্রস্তাবনা বা পরিচয়, (৩) মূল বক্তব্য বিষয়, (৪) সারাংশ পরিচয় ও (৫) উপসংহার।

(১) সম্ভাষণ বা **সম্বোধন ঃ** ভাষণের সূচনায় সভার সভাপতি ; প্রধান অতিথি এবং সভার উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ বা সম্বোধন জানাতে হয়। সাধারণতঃ 'মাননীয় সভাপতি মহোদয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী' (কিংবা ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ) বলে সম্বোধন করতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন সভা হলে সাধারণতঃ বলা হয় 'মাননীয় প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়গণ এবং উপস্থিত সতীর্থমণ্ডলী' (কিংবা ছাত্র-ছাত্রী বা ভাই-বোনেরা)। এই সম্ভাষণের আন্তরিকতার উপর ভাষণের গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ভাষণের প্রারম্ভে সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভাইগণ'। এই সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণ মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ হাততালি দিয়ে স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

সভায় উপলক্ষ্য অনুসারে সম্ভাষণের রীতি উপস্থিত মত বক্তা নিজে তৈরি করে নিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য—আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি। এই পরিবেশ সৃষ্টির উপরই নির্ভর করবে সমগ্র ভাষণের সাফল্য।

(২) প্রস্তাবনা বা **পরিচয় ঃ** সম্ভাষণের পর সভার উপলক্ষের কথা কিংবা তার প্রয়োজনের কথা বিবৃত করা হয় এবং সেই প্রসঙ্গে মূল বক্তব্যের পূর্বাভাষ দিতে হয়। অনেক সময় বক্তা এই অংশে সভার উদ্যোক্তাদের কিংবা কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন। প্রস্তাবনা অংশের উপরই সমগ্র ভাষণের গাম্ভীর্য নির্ভর করে। এই সময় এমন ধরনের বাচনভঙ্গির অবতারণা করতে হয়, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ সহজেই ভাষণের মূল বিষয় জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং ভাষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মূল বক্তব্য বিষয় শুরু করার আগে এই অংশে বক্তা শ্রোতাদের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন।

(৩) মূল বক্তব্য বিষয় ঃ মূল বক্তব্য কখনই এলোমেলোভাবে উপস্থাপিত করা সমীচীন নয়। শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করার জন্য একটির পর একটি বিষয় ক্রমপরম্পরায় বিন্যস্ত করে প্রকাশ করতে হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে একটি বিষয়ের সঙ্গে পরবর্তী বিষয়ের যেন অঙ্গাঙ্গি যোগ বা সম্পর্ক থাকে। দীর্ঘ-ভাষণ কখনই কোন শ্রোতার মনঃপুত হয় না—তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন। সাধারণতঃ মূল বিষয়টির প্রকাশ আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ করা উচিত। মূল বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করার সহজ যুক্তিজাল বিস্তারের প্রয়োজন আছে এবং বক্তব্য অংশকে সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের জন্য প্রয়োজনবোধে বিপরীত মত খণ্ডনেরও প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা মূল বক্তব্য শ্রোতাদের চিত্তে প্রোথিত হয়ে যায়। মূল বক্তব্যটি আগাগোড়া সুষম ও শিল্পময় হয়ে উঠবে—কোথাও বক্তব্যের প্রকাশ হবে ভাব-গম্ভীর, কোথাও বা হবে পরিহাসময় তির্যক বাক্যসমষ্টিতে পূর্ণ; কোথাও হবে প্রশ্নাত্মক। কিছুটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে এই অংশগুলি পরিবেশন করলে বক্তব্য সহজে শ্রোতৃবর্গের মনে রেখাপাত করবে। ক্লান্তিকর পরিবেশ অপনোদনেও এই বিষয়টি প্রধানভাবে সহায়ক হয়ে উঠবে।

(৪) **সারাংশ পরিচয় ঃ** মূল বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে শ্রোতৃবর্গ যাতে সহজে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন, সেজন্য বক্তৃতার সারাংশ (synopsis) এই অংশে উপস্থাপিত করা হয়। এতে ভাষণের গাম্ভীর্য বজায় থাকে এবং শ্রোতৃবর্গের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে সারাংশ পরিচয় দেবার সময় মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার সঙ্গতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। সারাংশ পরিচয় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা বিধেয়।

(৫) **উপসংহার ঃ** বক্তৃতার শেষে মূল বক্তব্য বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আবেদন করা হয়। উপসংহার অংশে এই আবেদনের কথা প্রধানভাবে বলা হয়ে থাকে। তবে এই আবেদন সোজাসুজি না করাই বিধেয়। বক্তৃতার শেষে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে কিংবা সকলকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কৌশলে সেই আবেদনটি প্রকাশ করতে হয়। বক্তৃতার শেষ অংশটি কিছুটা আবেগময় হলে মন্দ হয় না; কারণ এই আবেগের রেশ শ্রোতৃবর্গের মনকে বিহ্বল করে তুলতে পারে এবং তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

● ভাষণকে সফল করার প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ

ভাষণকে সফল করার জন্য বক্তা বা ভাষণ-দাতার কয়েকটি গুণ অপরিহার্য। এগুলির সঙ্গে ভাষণের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও বক্তৃতা-মঞ্চে সাফল্য অর্জনের জন্য এগুলির প্রয়োজন যে আছে, তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

(১) বক্তার চেহারায় গাম্ভীর্যের ভাব ও আকর্ষণীয়তা।

(২) উদাত্ত কণ্ঠস্বর ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা।

(৩) বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী কণ্ঠস্বর উচ্চালয় কিংবা মধ্যম লয়ে আরোহ-অবরোহের (modulation of voice) ক্ষমতা।

(৪) ভাষণের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ।

(৫) ভাষণের মধ্যে উপযুক্ত যতির ব্যবহার।

(৬) মুদ্রাদোষ পরিহার।

(৭) উৎকৃষ্ট স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া।

(৮) ভাষণের বিষয় সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া এবং প্রয়োজন বোধে প্রস্তুত হওয়া।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁদের অধিকাংশই এই সকল গুণের যথার্থ অধিকারী ছিলেন।

উদাহরণ:

শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা-গ্রহণের সমর্থনে একটি বক্তৃতার খসড়া তৈরি করো। [উ. মা. ১৯৯৫]

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, সমবেত সুধীবৃন্দ এবং আমার সতীর্থগণ!

আজ আপনাদের সামনে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য উপস্থিত হয়েছি। শিক্ষাই আমাদের জাতির জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। শিক্ষার বিস্তার যেখানে যত বেশি, জাতীয় জীবনের উন্নতি সেখানে তত বেশি। শিক্ষাকে জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার। অনেকে মনে করতে পারেন কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরেজি ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে। আমি কিন্তু তা কোনমতেই সমর্থন করি না। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার প্রধান কথা—স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞান অর্জন ; মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে মন যতখানি স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে, আর কোন পথে তা হয় না।

বাংলা বাঙালীদের মাতৃভাষা, হিন্দী তেমনি হিন্দুস্থানীদের মাতৃভাষা। এমনি প্রত্যেক রাজ্যের মানুষরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলে। যাতে আমরা কথা বলি এবং সহজে স্বাভাবিকভাবে ভাব প্রকাশ করি, তাকে যদি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তবে ভাব-প্রকাশ, জ্ঞান-বিকাশ প্রভৃতি কত সহজ হয়ে উঠতে পারে। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের আয়োজন করা হলে মনের স্বাভাবিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। তিনি বলছেন, 'আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না'। তিনি আরো বলছেন, 'যেন কনে রইল বাপের বাড়ীর অন্তঃপুরে শ্বশুর বাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটা গেল কোথায়'? এই খেয়া নৌকা হল এপার ও ওপারের মাধ্যম। মন আর জ্ঞানের মিলনের মাধ্যম। মাতৃভাষা নইলে সত্যিকারের মাধ্যম রচিত হবে না। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তারলাভের এত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাতৃদুগ্ধ ব্যতিরেকে যেমন শিশুর প্রকৃত পুষ্টি অসম্ভব, তেমনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যতিরেকে প্রদত্ত জ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে নিচু স্তর থেকে শুরু করে উঁচু স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষাদান আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য—এই কর্তব্য কেবল শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য। শিক্ষার সার্বজনীনতার জন্য নয়,—মাতৃভূমি।র ও মাতৃভাষার মর্যাদা ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যও। এ বিষয়ে হয়তো সব ধরনের বই লেখা হয়নি ; তবে তা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করব। এছাড়া আরও যা কিছু অসম্পূর্ণতা আছে, তা দূর করতে হবে ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন হবে সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলন। তবেই আমাদের দেশের শিক্ষা সর্বাত্মক বিস্তৃতি লাভ করবে কৃষকের খামার থেকে শুরু করে বিধানসভা লোকসভার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। আসুন,—আমরা এই মহান কর্মযজ্ঞে সর্বাত্মক প্রেরণা লাভ করে এগিয়ে যাই। নমস্কার।

[বক্তা ঃ সুরঙ্কিতা মুকুল (একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী)]